মহাঐক্যজোটের মহাআন্দোলন
অতঃপর কী?

wPiiÄb miKvi

আবার সংকটের ঘূর্ণাবর্ত। আবার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালো মেঘ। মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আবার নতুন করে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ভোট বর্জন করার জন্য মহাজোট ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হওয়া এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নিরপেক্ষ না হয়ে আগাগোড়া পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকেই প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এদিকে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন অবিচল রয়েছে। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোটও সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় দেশ অনিবার্য সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সঙ্কট সমাধানে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার দোহাই দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাইছে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে। বিএনপি-জামায়াত জোটও এমনটাই চাইছে। তারা যেনতেন একটা নির্বাচন চায় এবং সে নির্বাচনে তারা জিততে চায়। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগসহ অন্যদলগুলো নির্বাচন বর্জন করলেই তাদের সুবিধা। তারা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে পারে। নির্বাচনে জিতে তারা সব কিছু 'ঠাণ্ডা' করে দিতে পারে।

সচেতন মহল মনে করেন, এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিলের মধ্য দিয়েই দেশে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এরশাদের মামলা হঠাৎ সচল হওয়া, শুনানি শেষ হওয়ার আগেই তড়িঘড়ি করে রায় ঘোষণা, তারপর আপিল আবেদন বাতিল হওয়া সব কিছুর পেছনে রয়েছে দুরভিসন্ধি। এই দুরভিসন্ধির প্রতিবাদও হয়েছে। প্রতিবাদ ও অসন্তোষের মুখে তার আপিল আবেদন গৃহীত হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু আপিল আবেদন শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। এরশাদকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মহাঐক্যজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও জোট নেতারা মুখে তা বলেন নি। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান ভূমিকার প্রতিবাদে এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ বেশ কিছু যৌক্তিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। মহাঐক্যজোটের পক্ষ থেকে এ ঘাষণা দেয়ায় দেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে সবাই আশঙ্কা করছেন। নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়া স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মহাঐক্যজোট যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে তা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত বলে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই মনে করেন। সে ক্ষেত্রে মোটামুটি নির্ভুল ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরও সময় প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা বারবার বলছে। চার দলেরও অবস্থান অভিন্ন। এই পরিস্থিতিতে সংকট উত্তরণে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের শরণাপন্ন হবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। সব মিলিয়ে রাজনীতিতে কালবোশেখীর আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা আরো প্রবল হয়েছে। এ সংকট কীভাবে, কবে কাটবে তা কেউই বলতে পারছেন না।

gnvHK¨‡Rv‡Ui †NvlYv

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহাজোটের পক্ষ থেকে আগামী ২২ জানুয়ারি 'পাতানো নির্বাচনে' অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি দুপুরে শেরাটন হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন বর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অবৈধভাবে প্রধান উপদেষ্টার পদ দখল করে ইয়াজউদ্দিন সাহেব বৈধ ভোটার তালিকাবিহীন একটি নির্বাচন করতে চান। কিন্তু আমরা এ ধরনের নির্বাচনকে বৈধতা দিতে পারি না। তিনি বলেন, সংবিধানের ৫৮ (ঘ) অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলা আছে। আর সেই ধরনের নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা নির্বাচনে যাবো। তিনি জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা করার জন্য যে কোন কঠোর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত হাল নাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইয়াজউদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে তিনি আগামী ৭ ও ৮ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচি পালনের কথা আবারো ঘোষণা দিয়ে বলেন, এর পরেও যদি দাবি মানা না হয়, তবে বঙ্গভবন লাগাতার অবরোধ করা হবে।

ivócwZi wei"‡× hZ Awf‡hvM

সংবিধানসম্মতভাবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের যাবতীয় দায় গিয়ে বর্তাচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ওপর। প্রধান উপদেষ্টা নির্দলীয় সরকারের পরিবর্তে বিএনপি-জামায়াতের ছায়া সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাঐক্যজোট নেতাদের অভিযোগ, তিনি বিএনপি-জামায়াতের নির্দেশে

জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি জনগণের অর্থসম্পদ লুণ্ঠনকারী, দুর্নীতিবাজ যারা রাতারাতি অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছে, সেই চোরদের নির্বাচিত করার ষড়যন্ত্র করছেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থাকে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন একটি সঠিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতেও ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই তাকে অবশ্যই প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে নতুন একজন প্রধান উপদেষ্টা।

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে শেখ হাসিনা বলেন, গত ২৯ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি সাহেব সংবিধান লংঘন করে নিজেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ঘোষণা করেন। আমরা তখনই বলেছিলাম, তিনি নিরপেক্ষ নন, নির্দলীয়ও নন। নিজেকে নির্দলীয় হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আমরা ১৪ দলের পক্ষ থেকে তার কাছে ১১ দফা করণীয় দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তার শুভবুদ্ধির উদয় হবে। কিন্তু তিনি ১১ দফা করণীয় মানেননি। পরবর্তী সময়ে প্রধান উপদেষ্টা ও ১০ উপদেষ্টা মিলে একটি প্যাকেজ প্রস্তাব দেন।

ওই প্রস্তাবে স ম জাকারিয়া ও মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীর পদত্যাগসহ দু'জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কথা ছিল। নতুন নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশনারদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ছিল প্যাকেজ প্রস্তাবে। ওই প্রস্তাবে প্রশাসনকে নির্দলীয়করণসহ অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, সব আইন কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনার প্রসঙ্গ ছিল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আমাদের দিক থেকে যখনই প্যাকেজ প্রস্তাব মেনে নেয়া হলো তখনই হাওয়া থেকে পাওয়া নির্দেশে প্রধান উপদেষ্টা ওই সর্বসম্মত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এরপরেও মহাঐক্যজোট গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনে অংশগ্রহণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিলের পর থেকে লক্ষ্য করা গেল, প্রধান উপদেষ্টা বিএনপি-জামায়াতের ডিকটেশন অনুযায়ী ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছেন।

তিনি বলেন, ৯০ দিনের মধ্যে ৬৫ দিন চলে গেছে। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন নিজেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টারূপে নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে কোন পদক্ষেপ নেননি। এ ব্যাপারে তার কোনো আন্তরিকতাও নেই। বরং প্রধান উপদেষ্টা নির্দলীয় সরকারের পরিবর্তে বিএনপি-জামায়াতের ছায়া সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহাজোট প্রার্থী বলেন, বর্তমান তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের আর ১৯ দিন বাকী। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, ৭ জানুয়ারির পর ভোটার তালিকা দেয়া হবে। অথচ ভোটার তালিকা বিধিমালা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে যাচাই-বাছাই করার জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে জনসমক্ষে টানিয়ে দেয়ার বিধান রয়েছে। তাহলে ২২ জানুয়ারি নির্বাচন হলে ১৫ দিন সময় নিয়ে যাচাই-বাছাই, পরবর্তীতে সংশোধন ও প্রকাশের সময় কোথায়?

সংবিধানের ১২১ ধারা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করে ভোটার তালিকা এবং ধর্ম-জাত-বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদে ভোটারদের বিন্যাস করে কোনো বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাবে না। অথচ নির্বাচন কমিশন ২০০০ সালের, ২০০০ সালের হালনাগাদ ও সম্পূরক– মোট তিনটি ভোটার তালিকা সরবরাহ করছে। এতে নাম, পিতার নাম, ভোটার নম্বর প্রভৃতিতে অনেক গরমিল আছে। অনেক ক্ষেত্রে একই ক্রমিক নম্বর ও হোল্ডিং নম্বরের বিপরীতে নাম, বয়স ও পেশা ইত্যাদি সব তথ্যই ভিন্ন। ২০০০ সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে, এমন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তালিকায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক হারে ভুয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারের কাছে সেই ভোটার তালিকা দেওয়া হবে, যা থেকে ইতিমধ্যেই মহাঐক্যজোটের নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা আরো বলেন, নতুন করে ভোটকেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে যার কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ৪/৫ মাইল দূরে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে মহাঐক্যজোটের পক্ষের ভোটাররা ভোট দিতে না পারে।

তিনি আরো বলেন, কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করেই নতুন ভোট কেন্দ্র বাড়ানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ৪/৫ মাইল দূরে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে মহাজোটের পক্ষের ভোটাররা ভোট দিতে না পারে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সকল প্রার্থীর প্রতি সমানভাবে আইন প্রয়োগ করছে না।

me wKQ GL‡bv RvgvqvZ-weGbwci Kâvq

বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে এখনো দলীয়করণ করে রাখা হয়েছে। ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদসহ স্বনামধন্য আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক দ্রুততায় চার্জশিট দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন সব প্রার্থীর প্রতি আইনের সমান প্রয়োগ করছে না। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন অন্যায়ভাবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে। ড. বদরুদ্দোজা

চৌধুরীসহ এলডিপি নেতাদের বাড়িঘরে হামলার পরেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে প্রটেকশন দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, র‍্যাব ও পুলিশকে আওয়ামী লীগসহ মহাঐক্যজোটের নেতাকর্মীদের হত্যা-গ্রেফতার-নির্যাতন ও হয়রানির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় যে সব নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল, তাদের আসামি হিসেবে দেখিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি হয়নি। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার না করে উল্টো নাগরিকদের বৈধ অস্ত্র জমা নিয়ে তাদের নিরাপত্তাহীন করা হচ্ছে। প্রশাসন নির্দলীয়করণ হয়নি। বরং বিএনপি-জামায়াত সরকারের মন্ত্রীদের ২০ জন পিএসকে বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের এখনো ওএসডি করে রাখা হয়েছে।

gnvHK¨‡Rv‡Ui 15 `dv KiYxq

মহাজোটের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সভপতি শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন। এগুলো হচ্ছে : প্যাকেজ প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ জেলা-উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত তিন শতাধিক দলীয় ব্যক্তি প্রত্যাহার, খসড়া ভোটার তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ, নির্বাচন আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে খসড়া তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নহ্যনতম ১৫ দিন সময় প্রদান, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ, সব ভোটারকে ভোটার আইডি কার্ড প্রদান, নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, নির্বাচনী ম্যানুয়েল অনুযায়ী পুরনো ভোটকেন্দ্রগুলো বহাল, প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করা।

নির্বাচন পর্যন্ত র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে তাদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। প্যাকেজ প্রস্তাব অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, সব আইন কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ পদে পরিবর্তন আনতে হবে। প্রশাসনকে দলীয়করণ মুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। চিহ্নিত দলীয় কর্মকর্তাদের ওএসডি করতে হবে। তাদের পরিবর্তে উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের পদায়ন করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই মহাঐক্যজোট নির্বাচনে যাবে।

৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার জন্য যেমন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তেমনি জনগণের ভোটাধিকার কার্যকর করারও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তিনি দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি উল্লেখ করে বলেন, ভোটার তালিকা নেই। র‍্যাব নেতাকর্মীদের হত্যা করছে, নির্যাতন চালাচ্ছে। এই অবস্থায় নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নীলনকশার সাজানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম চলছে। তিনি বলেন, মহাঐক্যজোট নির্বাচনের মাঠেই ছিল। কিন্তু মাঠে গিয়ে ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি সাজানো ও পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা-নিজামীকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার চক্রান্তের দৃশ্যপট দেখা গেল। ইয়াজউদ্দিন একটি সাজানো নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছেন। তিনি খালেদা-নিজামীর তাঁবেদারি করছেন। এ অবস্থায় নির্বাচন বর্জনই একমাত্র পথ। নেতৃবৃন্দ বলেন, এবারের স্লোগান হচ্ছে– 'হটাও ইয়াজউদ্দিন বাঁচাও দেশ'।

বর্জন এবং প্রতিরোধ

মহাঐক্যজোট শুধু নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তই নেয়নি, নির্বাচন প্রতিরোধ করার অঙ্গীকারও নিয়েছে তারা। এ জন্য তারা প্রতিরোধ আন্দোলনে নামবে। এরই প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে আগামী ৭ এবং ৮ জানুয়ারি দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচিতে রূপ নেবে। সেই সঙ্গে মহাঐক্যজোট লাগাতার বঙ্গভবন অবরোধের পাশাপাশি হরতাল এবং ঘেরাওসহ নানামুখী কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

বর্তমানে নির্বাচন প্রতিহত করার বিষয়ে মহাঐক্যজোটের প্রধান শরিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অতীতের অভিজ্ঞতার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সামনে আনা হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে। তবে নেতারা এবারকার চিত্র ভিন্ন রকম হবে বলে মনে করছেন। এ কারণেই তারা নির্বাচন প্রতিহত করার আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজনে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে নেতারা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসনকে টার্গেট করে ওইসব আসনের আওতাধীন ভোট কেন্দ্রগুলো ভোটার শূন্য রাখার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নবম সংসদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে বলে নেতাদের বিশ্বাস।

AvIqvgx jx‡Mi wejw¤Z †NvlYv

নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তটি শুধু আওয়ামী লীগের একার নয়, এটা বিএনপি-জামায়াত ছাড়া দেশের ডান-বাম সব দলের। এবারের আন্দোলনে শেখ হাসিনার সব অসাফল্যের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য, তিনি মহাজোটের ঐক্য

ধরে রাখতে পেরেছেন এবং দেশের রাজনীতিতে বিএনপি-জামায়াতকে একেবারে একঘরে করে ফেলেছেন।
ইয়াজউদ্দিন যখন বিএনপি'র নির্দেশে অসাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদটি দখল করেন, তখনই তাকে মেনে নিয়ে এক ধরনের বৈধতা দান করা ছিল চৌদ্দ দলের সবচেয়ে বড় ভুল। নির্বাচন কমিশন থেকে আজিজ, জাকারিয়া বা মোদাব্বির হটাও আন্দোলনের চেয়ে ইয়াজউদ্দিন হটাও আন্দোলন করাই ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বিএনপি'র চক্রান্তের ফ্রেমওয়ার্কে আজিজ, জাকারিয়া, মোদাব্বির নিঃসন্দেহে চুনোপুঁটি, রাক্ষস চক্রের আসল প্রাণভোমরা হলেন ইয়াজউদ্দিন। তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়া ছিল চৌদ্দ দলের সুইসাইডাল পলিসি।
সবচেয়ে ভালো হতো, যদি চৌদ্দ দল শক্ত আন্দোলন পাশে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিত। এই যে মাঝে মাঝে আন্দোলন, তারপর তার রশি টেনে ধরা অর্থাৎ মালগাড়ির মতো আন্দোলনের থেমে থেমে চলা, আপসের স্টেশনে সহসা সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া, তাতেই বিএনপি-জামায়াত চক্র অনমনীয় হওয়ার, একটার পর একটা অবৈধ ও অসঙ্গত কাজ করার সাহস পেয়েছে। তাদের ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমি সীমা ছাড়িয়েছে। যদি এমন হতো, দেশব্যাপী সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গে এবং সেই আন্দোলন পাশে নিয়ে চৌদ্দ দল নির্বাচনে যাচ্ছে, তাহলে আজকের উভয়সংকটে তাদের পড়তে হতো না।
চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন চৌদ্দ দলকে পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু সে পথ তারা অনুসরণ করতে পারেননি। বারবার আপসের চোরাবালিতে পা রেখেছেন। নইলে আন্দোলন সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে গণপাহারা বসিয়ে এবং ভোট গণনা পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখে বিএনপি'র ইলেকশন মেকানিজম ব্যর্থ করা এবং নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে আনা চৌদ্দ দলের পক্ষে সম্ভব ছিল। তারা সে পথে যাননি। এখন তাদের সামনে একটাই পথ খোলা, দাবি-দাওয়া আদায় অর্থাৎ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা। শেষপর্যন্ত তারা সেই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছেন।

Gikv`‡K wb‡q 14 `‡ji †KŠkj

মহাঐক্যজোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত কেন আগেই গ্রহণ করলো না– রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদের অতীতের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাকে মহাঐক্যজোটে আটকে রাখতেই মূলত এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার দিন নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলে এইচএম এরশাদকে নিয়ে প্রতিপক্ষ বিএনপি-জামায়াত জোট নতুন রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নের সুযোগ পেত। সে ক্ষেত্রে এরশাদ প্লাটফর্ম বদলে বাধ্য হতেন। আবার ৭ জানুয়ারি নির্বাচন থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয়া হলে একই চাপে পড়তেন এইচএম এরশাদ। ৩ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়ায় আপাতত এরশাদকে নিয়ে প্রতিপক্ষের রাজনীতির সুযোগ নেই।

weGbwc GLb Kx Ki‡e?

বিএনপি-জামায়াত জোট এবারও সংসদে এরশাদকে সংসদীয় বিরোধী দলের নেতা বানিয়ে একটি গৃহপালিত বিরোধী দল খাড়া করার পাঁয়তারা চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। এরশাদ মহাজোটে যোগ দেয়ায় এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন মহাজোট নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়ায় তাদের সেই অভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। মহাজোটের আন্দোলনের মোকাবিলায় বিএনপি এখন তাহলে কী করবে? বিএনপি জন্মাবধি যে আচরণের পরিচয় দিয়ে এসেছে তাতে মনে হয়, তাদের কব্জায় বন্দি প্রশাসনিক শক্তি ব্যবহার করে তারা এ আন্দোলন দমনের চেষ্টা করবে। পাশাপাশি দেদার টাকা ছড়িয়ে চৌদ্দ দলের কিছু প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করতে চাইবে। সেই সঙ্গে '৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মতো একটি একতরফা জালিয়াতির নির্বাচন করে একটি অবৈধ সন্তানের (সরকারের) জন্ম দিতেও তারা পারে।
এখন তাদের সামনে এখন একটাই পথ, তথাকথিত চারদলীয় জোট ভেঙে দিয়ে জামায়াতকে বিরোধী দলের প্রক্সি দেয়ার জন্য আলাদাভাবে দাঁড় করানো এবং জামায়াতের আরো কিছু বেশি প্রার্থীকে সংসদে বিজয়ী ঘোষণা করে তাদের মাধ্যমে সংসদীয় বিরোধী দল খাড়া করা। তবে এ ক্ষেত্রেও সন্দেহ আছে, গোটা সিভিল ও মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জুডিসিয়ারিসহ) এবার কুক্ষিগত করার পরও বিএনপি '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের একতরফা খেলা খেলতে চাইলে তাতে সফল হবে কি-না। দেশের সব মানুষ এখন বিএনপি-জামায়াতের ওপর ত্যক্ত, বিরক্ত এবং মহাক্ষুব্ধ। অক্টোবরে ক্ষমতা ত্যাগের (সত্যিকার অর্থে ক্ষমতা ত্যাগ করেনি) পরও তাদের চক্রান্তের রাজনীতি, একটার পর একটা অসাংবিধানিক কার্যকলাপ দেশের মানুষের চোখে নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। এ অবস্থায় মহাজোটের আন্দোলনের ডাকে জনসিংহ যদি সত্যি গর্জে ওঠে, তাহলে এসটাবলিসমেন্টের সব অংশ বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবে বা হাওয়া ভবনের হুকুম মেনে চলতে চাইবে, এমন গ্যারান্টি দেয়া যাচ্ছে না।

তাহলে কী ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশে? অনেকের ধারণা, বাংলাদেশ আরেকটি বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় বিদেশী কূটনীতিকরা, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত যদি কঠোর চাপ প্রয়োগ করে বিএনপির হুঁশ ফেরাতে না পারে অথবা হুঁশ ফেরাতে না চায়, তাহলে সংঘাত-সংঘর্ষ অনিবার্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, গোটা দেশবাসীর অসন্তোষ ও বিরোধিতার মুখে বিএনপি ১৫ ফেব্রুয়ারি-মার্কা আরেকটি অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। এবার সন্তান জন্ম দেয়ার আগেই তাদের পিছু হটতে হবে। চাই কি ক্ষমতা ছেড়েও পালাতে হবে। বিএনপি যদি মহাজোটের দাবি-দাওয়া উপেক্ষা করে ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে একটা একতরফা নির্বাচন দ্বারা নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করে এবং সরকার গঠন করে তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাদের মাথায় সুবুদ্ধির উদয় হলে তারা মহাজোটের দাবি মানার ব্যাপারে নমনীয় হবেন এবং একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টিতে সম্মত হবেন। তাতে তাদের জান ও মান দুই-ই রক্ষা পাবে। কিন্তু পাকিস্তানের গোয়েন্দা চক্র আইএসআইয়ের যে কৌশল ও প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে কাজ করছে, তাতে বিএনপি সহজে অথবা সহসা নিজেদের একগুঁয়েমি ত্যাগে রাজি হবে বলে মনে হয় না। যদি হয় তাহলে বাংলাদেশের মানুষ এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

†Kšk‡ji †Ljvq Pvi `‡ji mvdj¨B †ewk

একটি সুনির্দিষ্ট ছক ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পথ চলেছে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট। তাদের কৌশল মারমুখি নীতির কাছে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলো প্রতিনিয়ত মার খেয়েছে। ৪ দলীয় জোটের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো কার্যকর কোনো কর্মসূচি ঠিক করতে পারেনি। বড় কোনো ছাড় না দিয়ে, নিজেদের পরিকল্পিত কাঠামোয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তারা। সিরিজ বোমা ও ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, শাহ্ এএমএস কিবরিয়া হত্যা, দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানি তেল ও সার সংকট, দুর্নীতি, লুটপাট ও টেন্ডারবাজির মতো অসংখ্য ইস্যু ছিল প্রতিপক্ষের সামনে। এসব ইস্যুতে ১৪ দলের কিছু কর্মসূচিও পালিত হয়েছে। কিন্তু জোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার মতো কোনো আন্দোলন করতে পারেনি ১৪ দল। এটি সম্ভব হয়েছে বিএনপি ও ৪ দলীয় জোটের কিছু কৌশলের কারণে। একই কারণে 'সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশে কোনো নির্বাচন করতে দেয়া হবে না ' এমন কঠোর ঘোষণা থেকে ১৪ দল কিছু ব্যক্তি ইস্যুতে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ফলে ক্ষমতার ৫ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৭০ দিনে ৪ দলকে বড় ধরনের কোনো বিপর্যয়ে পড়তে হয়নি। বরং উইনিং কন্ডিশন ধরে রেখেই সদ্য সাবেক জোটটি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে পেরেছে।

যখনই আওয়ামী লীগ বা ১৪ দল সুনির্দিষ্ট কোনো ইস্যুতে আন্দোলনের চেষ্টা করেছে তখনই অন্যত্র ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ওই ইস্যু থেকে প্রতিপক্ষকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এ অবস্থায় মৌলিক ইস্যু থেকে ব্যক্তি ইস্যুতে সরে গেছে ১৪ দল। এক্ষেত্রেও কৌশলে ওই ব্যক্তি পরিবর্তন করে অধিক পার্টিজান লোককে সেখানে বসিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে তারা। প্রধান উপদেষ্টা, সিইসি এবং আইজিপিসহ গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রেই এ সুযোগটি নিয়েছে ৪ দল। শুধু তাই নয়, এবারই প্রথম কোনো বিদায়ী সরকারের নেতাকর্মীরা এতোটা স্বচ্ছন্দে নির্বাচনী তৎপরতায় অংশ নিতে পারছে। অনেক চেষ্টার পরও এমনকি জাতীয় পার্টি, এলডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটকে সঙ্গে পেয়েও ৪ দলের মতো স্বচ্ছন্দে নেই ১৪ দল। নির্বাচনী দৌড়ে ৪ দলের সমকক্ষ হতে ১৪ দলকে এখন তাদের রাজনৈতিক আদর্শের পরিপন্থি ফতোয়া ও ব্লাসফেমি জাতীয় বিষয়ে ইসলামী দলের সঙ্গে চুক্তি করে 'আত্মসমর্পণ' করতে হয়েছে। ফলে তারা বিএনপিকে মৌলবাদী শক্তির মদদদাতা বলে ঘায়েল করার নৈতিক শক্তি হারিয়েছে। এতোদিন বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল জামায়াতকে নিয়ে সরকার গঠনের। জবাবে বিএনপিকে বলতে হতো আওয়ামী লীগও ৯৬ সালে জামায়াতের সঙ্গে আন্দোলন করেছে। এখন উল্টো আওয়ামী লীগকে ফতোয়াবাজির মদদদাতা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফতোয়া চুক্তির কারণে দেশের প্রগতিশীল নাগরিক এবং বাম দলগুলো আওয়ামী লীগের ওপর এখন ক্ষুব্ধ।

বিএনপি কৌশলে আদালতের মাধ্যমে এরশাদকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। শেষ মুহূর্তে বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে ক্ষমতায় যাওয়ার পথকে করেছে নিষ্কণ্টক। নানা রকম অনাচার, দুর্নীতি-লুটপাট, দুঃশাসন, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি কারণে যেখানে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের গণপিটুনি বা গণরোষের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়াটাই এ মুহূর্তে মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে। যে কোনো মূল্যে আবার ক্ষমতায় এলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সব আন্দোলন সব বিরোধিতা যাবতীয় প্রতিবাদ 'ঠাণ্ডা ' করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করবে–এই স্বপ্নে তারা আপাতত বিভোর। এমন স্বপ্ন দেখতে পারাটাকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোটের কৌশলগত বিজয় বলেই মানতে হবে।

14 `‡ji 5kÕ 30 w`‡bi Aw‡›`vj‡bi KvjcwÄ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন ইস্যুতে ২০০৫ সালের ১৫ই জুলাই থেকে টানা ৫শ' ২৭ দিন আন্দোলন করেছে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল। এর মধ্যে দফায় দফায় হুমকি-ঘেরাও-অবরোধ ও হরতাল পালন করেছে। ছিল বঙ্গভবন ও সচিবালয় ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি। অবশেষে তারা নাটকীয়ভাবে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে গত ৩ জানুয়ারি সবাইকে চমকে দিয়ে নির্বাজন বর্জনেরও ঘোষণা দিয়েছে। এ সময়ে তাদের দফায় দফায় আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদে আসতে পারেন নি বিচারপতি কেএম হাসান। তার বদলে ওই পদে আসীন হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। সিইসি বিচারপতি এমএ আজিজ ও নিবাচন কমিশনার স ম জাকারিয়াকে ছুটিতে যেতে হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বদলি করা হয়েছে। তবে মূল দাবি সংস্কার ইস্যু আড়ালেই রয়ে গেছে। হয়েছে কেবল কয়েকটি পদে ব্যক্তির পরিবর্তন। ১৪ দলের আন্দোলনের এ কালপঞ্জি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তারা এ সময় আট দিন হরতাল, ১২ দিন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঘেরাও, ১৭ দিন সারা দেশে অবরোধ ও এক দিন নির্বাচন কমিশন কর্মসূচি পালন করেছে। এ আন্দোলনে ১৪ দল ও প্রতিপক্ষ চার দলের শতাধিক নেতাকর্মী নিহত হয়েছে। ঘটেছে ২ শতাধিক সহিংস ঘটনা। এবার ১৪ দল মহাজোটের ব্যানারে মহাআন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্দোলনের পরিণতি কী এখন সেটাই দেখার বিষয়।

mgm¨vi †_‡K gnvmsK‡U DËiY

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা গতকাল সংকটের চোরাগলি থেকে সমস্যার মহাসড়কে উপনীত হয়েছে। এতোদিন সংকটের স্বরূপ বোঝাও ছিল দুরূহ। কৌশল আর প্রতিকৌশলে এক ধরনের অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল। গত ৩ জানুয়ারি মহাঐক্যজোটের 'শেরাটন ঘোষণা'র মধ্যদিয়ে সেই পরিস্থিতির অবসান হলো।

এই ঘোষণার আগে পর্যন্ত আন্দোলনরত দলগুলোর দাবি পূরণের জন্য সংবিধান তথা আইনি কাঠামোর ভেতরে থাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সুযোগ ছিল। সেই সুযোগের চরম ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণে এক ধরনের বালখিল্য বা ছেলেমানুষী প্রচেষ্টাই এতোকাল আমরা লক্ষ্য করেছি। আজ থেকে সেই সুযোগও আর রইল না।

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে কেবলমাত্র প্রচলিত আইন এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ভেতরে বিবেচনা করার প্রবণতা পরিহার করে অগণন মানুষের 'ইচ্ছা'কে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিতে হবে।

বিগত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে আজকের মহাঐক্যজোট দেশের ৫০ ভাগ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে অবশ্যই। কেবলমাত্র আইন ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাতে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর পক্ষের দাবি উপেক্ষা করা ন্যায়বিচার এবং সুবিবেচনার পরিপন্থী হতে পারে না।

আজ এখন তথাকথিত সাংবিধানিক বিধিবিধানের আওতায় এক অর্থে আর কোনো সুসমাধান নেই। এখন নিয়মের বাইরে ভাবতে হবে। আজ আন্দোলনকারীদেরও 'সমঝোতা' বা পিছু হটবার পথ নেই। তথাকথিত সমঝোতার প্রশ্নও এখন অবান্তর। বিএনপি অতি দুরাশায় আওয়ামী লীগের সামনে নির্বাচনে যোগ দেওয়ার কোনো পথই খোলা রাখেনি। একটার পর একটা বাধার প্রাচীর তারা খাড়া করেছে। ফলে নির্বাচন থেকে সরে গিয়ে আওয়ামী লীগকে আন্দোলনে নামার একটি মাত্র খোলা পথের দিক এগুতে হয়েছে। বিএনপি অতীত থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। আর সে কারণেই সমস্যা পরিণত হয়েছে সংকটে। এখন সংবিধানের দোহাই দিয়ে বিএনপি নেতৃত্ব একতরফা নির্বাচনের পূর্বনির্ধারিত ছক অনুযায়ী এগুবে, না জনমতকে বিবেচনায় নিয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আন্দোলনরত দলগুলোর সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে সকল দলের অংশগ্রহণ সাপেক্ষে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির পর নির্বাচনে অংশ নেবে– তার ওপরই নির্ভর করছে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। অতীতের শিক্ষা কাজে না লাগিয়ে বিএনপি যদি আবারও স্রেফ ক্ষমতার মোহে একতরফা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে তবে তা দলটির জন্য শেষ শিক্ষাও হতে পারে।

ঢাকা, ৫ জানুয়ারি ২০০৭

chiroranjan@gmail.com